৪১ *Islam in Bangladesh Through Ages*, p. 14.

৪২ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৭-৬৮।

৪৩ ইবন বাতূতাহ, '*আজায়িবুল আসফার*, অনুবাদঃ খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন, ২য় খ (দিলণ্টীঃ ১৯১৩), পৃ. ৩২১।

৪৪ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৮।

৪৫ নাসির হেলাল, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ. ২৩।

৪৬ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৮-৬৯।

৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

৪৮ ছাকাফী গোত্রের সেনাপতিগণ হলেনঃ 'উছমান আছ ছাকাফী, তার ভাই মুগীরা আছ ছাকাফী, হারিছ ইবন মুররাহ আল-'আবদী। দ্র. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৯।

৪৯ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬৯।

৫০ *সুনান আন-নাসায়ী*, পৃ. ৪৩৮।

৫১ *প্রাগুক্ত*।

৫২ *ইসলামী দা'ওয়াতের মর্মকথা*, *ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১৪৪।

৫৩ তিনি ইরাক থেকে তুর্কিস্থান ও সিন্ধু পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের গভর্নর ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর অত্যন্ড় দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্র. *ইসলামী দা'ওয়াতের মর্মকথা*, *ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১৪৪।

৫৪ *আরবোঁ কী জাহাজরানী*, পৃ. ৮।

৫৫ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭০।

৫৬ *ইসলামী দা'ওয়াতের মর্মকথা*, *ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, পৃ. ১৪৫।

৫৭ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭০।

৫৮ সায়্যিদ সুলায়মান নাদভী, "কাযী সাময়ানীর গ্রন্থে উপমহাদেশে হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাস", অনুবাদঃ লুৎফর রহমান ফারকী, *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকা, জুন, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ১৭।

৫৯ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগ* (প্রকাশনা ও তা.বি.), পৃ. ৪৩-৪৪।

৬০ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭১।

৬১ Khan Saheb Abid Ali Khan, *Memorise of Gour and Padua*, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ চৌধুরী শামসুর রহমান, *গৌড় ও পান্ড়ুয়ার স্মৃতি* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১-২।

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধঃ প্রেক্ষিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোঃ তসিকুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংঘটিত প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ হচ্ছে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী নেতৃত্বে বাংলার মানুষ অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী আপোষহীন ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। তারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাক সেনাদের প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনে সর্বাত্তক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২৫ মার্চ ঢাকায় ভয়াবহ গণহত্যার সংবাদ পাওয়া মাত্রই ২৬ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৬নং উইংয়ে অবস্থানরত বাঙ্গালি সেনাবাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীও একযোগে পাক সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই একজন পাক সেনা ব্যতিত সবাই মারা পড়ে। এভাবে প্রতিরোধ যোদ্ধারা চাঁপাইনবাবগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করে এমনকি রাজশাহীকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে। সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ২৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ড় চাঁপাইনবাবগঞ্জকে শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ২১ এপ্রিল পাক সেনারা নবাবগঞ্জকে পূণর্দখল করলেও পরবর্তীতে এই প্রতিরোধ যোদ্ধারাই আরও উন্নত যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং আপামর জনতাকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করে চূড়ান্ড় যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ের দিকে ধাবিত হয়। যার ফলশ্রুতিতেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা অর্জন করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৭১ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছিল রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা। একাত্তরে পাকিস্ড়ানি সৈন্যদের সাথে মুক্তিবাহিনীর অনেক খ খ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সকল যুদ্ধে ভারতের কোন বড় ধরণের সাহায্য ছাড়াই মুক্তিবাহিনী পাকিস্ড়ানি সৈন্যদের পিছু হটতে এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের অবস্থান ছিল ৭ নম্বর সেক্টরে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১২ মার্চ ১৯৭১ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ছিল এ ধরণের দ্বিতীয় ঘটনা।[১] চাঁপাইনবাবগঞ্জেই প্রথম মুক্তিযুদ্ধের স্বশস্ত্র লড়াই শুর হয় বলে মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এসসি দাবী করেন। তাঁর মতে, ২৩ মার্চ একজন পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্য রহনপুর ইপিআর ক্যাম্পে সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে গেলে বাঙালি সৈন্যরা পাঞ্জাবি সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। পরদিন ২৪ মার্চ একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্য ঘটনা তদন্ড় করতে গেলে বাঙালি

* গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাবিলদার আক্কাস পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেনকে গুলি করে হত্যা করেন। ২৩ মার্চ প্রতিরোধ ও ২৪ মার্চ ক্যাপ্টেনকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বাঙালি ইপিআর পাকিস্ড়নি বাহিনীর বির"দ্ধে লড়াই শুর" করে।[২] ২৫ মার্চ রাজশাহী সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে ১৫/১৬ জন অবাঙালি ইপিআর একজন সিকিউরিটিসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসে। এ সময় ইপিআর ৬নং উইং ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে। পশ্চিমা বাহিনীরা এদিন সকাল থেকেই বাঙালি ইপিআরদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এরূপ আচরণ বাঙালিদের কাছে সন্দেহপ্রবণ হওয়ায় তারা অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৩]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় ভয়াবহ গণহত্যার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হতে শুর" করে।[৪]

২৬ মার্চ দিনের বেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্যাম্পে অবস্থানরত ইপিআররা চট্টগ্রাম থেকে ইপিআর অয়ারলেসে খবর পায় যে, ঢাকাতে বাঙালি ইপিআরদের খতম করা হয়েছে। সংবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআরদের আত্মরক্ষার্থে সতর্ক করে দেয়া হয়।[৫]

এ দিনেই বিকালে শহরে কার্ফু জারী করা হয়। এ দিনেই ইপিআর এর ৬নং শাখার কর্তৃপক্ষ এই শাখার বাঙালি ইপিআর সদস্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে।[৬]

সন্ধ্যা ৭টায় কয়েকজন বাঙালি এন.সি.ও.[৭] হাবিলদার মোস্ড়ফা কামাল, হাবিলদার জমজম আলী, হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান, হাবিলদার সৈয়দ আলী তালুকদার এবং কিছু সংখ্যক নায়েক ও সিপাহী পাকিস্ড়নি কয়েকজন এন.সি.ও.র সঙ্গে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ ব্যাটালিয়ান উইং কমা"ার মেজর গুলজার আলী খান পশ্চিম পাকিস্ড়ন এন.সি.ও.দের চোখের ইশারায় ডেকে নেয়। তাদের এরূপ আচরণে বাঙালি ইপিআরদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তারা সর্তক অবস্থান নেয়। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই রাজশাহী সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি মেসেজ আসে। এতে পাকিস্ড়নি সমস্ড় অফিসার ও জোয়ানদের পরিবারকে অবিলম্বে রাজশাহী পাঠিয়ে দিয়ে এখানকার বাঙালি ইপিআরদের নিধন করতে বলা হয়। সমস্ড় বাঙালি ইপিআরদের খতম করে সবাইকে রাজশাহীতে যাবার নির্দেশও দেয়া হয় এই মেসেজ। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই মেসেজটি বাঙালি অয়ারলেস অপারেটারের নিকট পৌঁছালে সে বাঙালি ইপিআর সংবাদটি জানিয়ে দেন। পরে মেসেজটি উইং কমা"ারের হাতে পড়া মাত্রই তারা বাঙালি ইপিআরদের ওপর হামলা শুর" করে। প্রচ" গোলাগুলির মধ্যেই রাজশাহীর দিকে তিনজন পাক-অফিসার পরিবারসহ পালিয়ে যায়। প্রায় দুইঘন্টা গোলাগুলির পর পরিস্থিতি বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্ড়নি জেসিওকে বন্দি করা হয়, তখন রাত প্রায় এগারটা, ক্যাম্পকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর ইপিআররা বাইরের জনসাধারণকে খবর দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার জনতা শহরের আশপাশ থেকে ক্যাম্পে আসে ইপিআরদের সাহায্যে করার জন্য। জনতা এবং ইপিআরদের মিলিত বাহিনীর হাতে সেদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থানরত বেশ কিছু অবাঙালি ইপিআর সদস্য নিহত হয়।[৮]

২৭ তারিখ রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনগণ প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেল। সদ্য স্বাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রতিরোধ যোদ্ধাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ চিন্ড়িত হয়ে পড়েন। অবশেষে নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন আশপাশের এলাকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসময় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের নিকট সাহায্য সহযোগিতা চাইলে জনগণ অভাবনীয় সহযোগিতা করে। ২৭ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ড় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্র" মুক্ত ছিল। মুক্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই সময় অত্যন্ড় ভাল ছিল। এই সময় সমস্ড় চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিল এমনকি আওয়ামী লীগের ঘোর বিরোধী মুসলিম লীগ পার্টির দুই-একজন নেতা বাদে সবাই স্বাধীনতার মন্ত্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হচ্ছেন নুর"ল মেম্বার, কুতুবউদ্দীন, আলফাজ, সুলতানসহ মসজিদ পাড়া ও ফকির পাড়ার সব সদস্য। শুধু জামায়াত এবং তার অঙ্গসংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘ (ISS) এরা সবাই গা ঢাকা দেয়।[৯]

২৭ মার্চ সমগ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্র"মুক্ত হলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমস্ড় দল নিয়ে (কেবল জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ বাদে) চাঁপাইনবাবগঞ্জে 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতা ডা. আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার) সর্ব সম্মতিক্রমে সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। সদস্য হিসেবে মনোনীত হন যথাক্রমে: সর্বজনাব রইসউদ্দিন আহমেদ (জাতীয় পরিষদ সদস্য), খালেদ আলী মিয়া (জাতীয় পরিষদ সদস্য), শেরাজুল হক শনি মিয়া, গোলাম আরিফ টিপু, এ্যাড. ওসমান গণি, এ্যাড. হামিদুর রহমান হেনা, অধ্যাপক নওয়াব আলী, অধ্যাপক এনামুল হক, আহমদ উলণ্ডাহ চৌধুরী, এ্যাড. সুলতানুল ইসলাম মনি, এ্যাড. একরামুল হক ও আব্দুর রহমান প্রমূখ। এরা সকলেই চাঁপাইনবাবগঞ্জকে শত্র"মুক্ত রাখার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১০]

শত্র"মুক্ত স্বাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর দায়িত্ব কি হবে তা নির্ধারণের জন্য সংগ্রাম কমিটি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ উপাধ্যক্ষ মনিমুল হকের বাস ভবনে এক জর"রী সভায় মিলিত হন। সভায় সিদ্ধান্ড় হয় যে, অতিসত্ত্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহীকে শত্র" মুক্ত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হবে। আরো সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় যে, সুবেদার মেজর আবুল কাশেম পরবর্তীতে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, সীমান্ড় থেকে শহরে সকল ইপিআরদের সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং মুজাহিদ বাহিনীর নুর"ল ও কুতুবকে সমস্ড় মুজাহিদ ও আনসারদের একত্রিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সংগ্রাম কমিটি অত্যন্ড় অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ, আনসার, ইপিআর, মুজাহিদ বাহিনী যারা পূর্বেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন তাদের নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠন করেন। ইতোমধ্যে হরিমোহন স্কুল মাঠে ছাত্রদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। ইপিআর জোয়ানদের দিয়ে এসব ট্রেনিং পরিচালিত হত। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দই এসব কার্যক্রম তদারকি করত।[১১] সংগ্রাম কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে এক হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী গড়ে তোলে। ছাত্রনেতা মহাম্মদ আলী কামাল ও আলাউদ্দিন সংগ্রাম কমিটির নির্দেশনায় রাজশাহী শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য

যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েন। এসময় তারা একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরকে পান এবং তাকে জানান যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে এখন বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা উড়ছে। দুই-একদিনের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুক্তি সেনারা রাজশাহী সেনানিবাস ঘেরাও করবে। ৩০ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সম্মিলিত বাহিনী গোদাগাড়ি থানার মহিষাল বাড়ি পর্যন্ড় অগ্রসর হয়।[১২]

মুক্তিবাহিনী চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দুরে গোদাগাড়িতে ডিফেন্স তৈরি করে। রাত্রির অন্ধকারে পাক বাহিনী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ওপর ব্যাপকভাবে গোলাগুলি চালাতে আরম্ভ করে। গোলাগুলির মধ্যেই মুক্তিবাহিনী পাল্টা জবাব দিতে দিতে রাজশাহীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শত্রু বাহিনী ক্রমশই পিছু হটতে আরম্ভ করে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা রাজশাহীর উপকণ্ঠ কাশিয়াডাঙ্গাতে অবস্থান নিলে ক্যাপ্টেন গিয়াস তার বাহিনী নিয়ে নওগাঁ থেকে এসে এখানে মিলিত হয়। এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বভার অর্পিত হয় ক্যাপ্টেন গিয়াসের ওপর।[১৩]

৩১ মার্চের রাতে ২৫ পাঞ্জাবের একটি পেট্রোলবাহিনী[১৪] তিনটি গাড়ি নিয়ে সেই রাস্ড়ায় আসে। সম্মিলিত বাহিনী আতর্কিত তাদেরকে এ্যামবুশ[১৫] করে। সম্মিলিত বাহিনী ওদের ৭ জনকে নিহত অবস্থায় এবং ১ জনকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। সেই বন্দীর কাছ থেকে জানা যায় যে, ক্যাপ্টেন সালমান নামক এক অফিসার তাদের পেট্রোল পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং একটা পণ্টুন পেট্রোলে এসেছিল। শত্রুপক্ষের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয় এবং তারা দ্রুত আহত-নিহতদের অধিকাংশ নিয়ে পালিয়ে যায়। এতে সম্মিলিতবাহিনীর মনোবল অনেক বেড়ে যায় এবং দ্রুতগতিতে রাজশাহী শহরের দিকে অগ্রসর হয়। ১ এপ্রিল সকাল ৬ টার দিকে সম্মিলিতবাহিনী রাজশাহী শহরের অদূরে তাদের ডিফেন্স তৈরি করে। পাকিস্ড়ানিবাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহের জন্য অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গিয়াস পেট্রোল বাহিনী নিয়োগ করেন। অপর দিকে ক্যাপ্টেন রশিদ সারদা থেকে রাজশাহী শহরের পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন।[১৬]

৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭টার সময় শত্রুবাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল গোলা-গুলি বর্ষণ করতে থাকে। অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা বীরদর্পে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকে এবং শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রায় চার ঘণ্টা লড়াইয়ের পর রাজশাহী শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহীর চতুর্দিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। বেশকিছু পশ্চিমা সেনাসদস্য নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর ৩০/৩৫ জন হতাহত হয়। রাজশাহী পুলিশ লাইনসহ অন্যান্য জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনী বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে। রাজশাহী পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে প্রায় তিন হাজার অস্ত্র, তিন লাখ গুলি উদ্ধার করা হয়। বাকী শত্রুবাহিনী সেনাছাউনিতে পশ্চাদপসরণ করে এবং সেখানে একত্রিত হয়ে আরো শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। তারা তাদের ছাউনির চারপাশে মাইন পুঁতে রাখে এবং কাটা তারের বেড়া দিতে শুরু করে। এতে রাজশাহীবাসীর মনে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।[১৭]

৭ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ড় মুক্তিবাহিনী শত্রুবাহিনীর ছাউনির ৩০০/৪০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু শত্রু বাহিনীর মাইন এবং কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে গিয়ে আক্রমণ চালানো বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। শত্রুবাহিনী সমস্ড় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান, তিন ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি বাইরের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখে। সেই সময় শত্রুবাহিনীর ছাউনিতে ২৫০ থেকে ৩০০ সৈন্য অবস্থান করছিল। এদের অনেক সৈন্য এসময় হতাহত হয় এবং বহু সৈন্য নিখোঁজ হয়। শত্রু সৈন্যরা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শওকত (বেলুচ), সিতারা-ই-জুরাত প্রমুখ ৭ এপ্রিলের যুদ্ধে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হয় এবং তাদেরকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় নিয়ে যায়। সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখে শত্রুবাহিনীর মনোবল সম্পর্ণূরূপে ভেঙ্গে যায়। শত্রুবাহিনী সে এলাকার সমস্ড় বিহারীকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে তাদেরকে সাহায্যে করতে নির্দেশ করে।[১৮]

সম্মিলিত বাহিনী যখন শেষ প্রচেষ্টা দিয়ে শত্রু ছাউনি দখল করতে ব্যাস্ড় তখন সংবাদ পাওয়া যায় যে, শত্রু বাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য নগরবাড়ী ঘাটে অবতরণ করার চেষ্টা করছে। শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর দুই কোম্পানী সৈন্য পাবনার অনতিদূরে মুলাডলী নামক স্থানে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। কিন্তু শত্রুবাহিনীর জংগী বিমানের হামলা, আর্টিলারীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্যর বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ লড়াই করে টিকতে না পেরে মুক্তিবাহিনী পশ্চাদপদসরণ করে।

১২ এপ্রিল শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সারদা এবং রাজশাহী যাওয়ার মোড়ে শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। তখন শত্রু বাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যূহের অতি নিকটে পৌঁছে যায়। মুক্তিবাহিনী শত্রু বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে রোধ করার জন্য রাস্ড়ার মধ্যে গর্ত খুড়ে, বড় বড় গাছ কেটে রাস্ড়ার ওপর ফেলে বুবিট্র্যাপস মাইন পুতে রাখে। ১২ এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ শত্রু বাহিনী সেখানে পৌঁছে এবং ব্যারিকেড ভাঙতে চেষ্টা করে। বুবিট্র্যাপস ফেটে এবং মাইন বিস্ফোরণ হয়ে বেশ কিছু শত্রু সৈন্য হতাহত হয়। সারারাত দুপক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই চলে। এই যুদ্ধে কোম্পানী কমান্ডার এ,বি,সিদ্দিকীসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

১৩ এপ্রিল ভোরের দিকে সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ড় পৌঁছে যায়। তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে সেখান থেকে অনবরত আটিলারী ফায়ার করতে থাকে এবং জংগী বিমানের হামলাও তাদের অব্যাহত থাকে। সম্মিলিত বাহিনী তাদের মনোবল অটুট রাখে এবং শহরের চারিদিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ অব্যাহত রাখে এবং ছাউনি দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

১৪ এপ্রিল রাত দুটোর দিক থেকে শত্রুবাহিনী বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং গোলান্দজ বাহিনীও ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। প্রচন্ড আক্রমণের মুখে মুক্তি বাহিনী একে অপরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভোর পাঁচটার দিকে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর এক বিগ্রেড সৈন্য মুক্তিবাহিনীর ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। এতে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ে এবং